ইতিহাসের আলোছায়া

(উপেক্ষিত ও অবহেলিত ইতিহাসের সন্ধানে)

জিয়াউল হক

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

আকলমান্দ কে লিয়ে ইশারাই কাফি হায়	১১
হায়! আমাদের উপায় কী	১৫
আর সেই ভুল করব না, প্রমিজ	১৯
কলকাঠির কলকাতা	২৩
গ্রানাডার কান্না	২৯
অপেক্ষা কেবল সময়ের	৩৫
নিরাপদ নারীত্বেই সভ্যতা নিরাপদ	৩৮
পচা পান্তার চড়া মূল্য	৪১
যে আগুন নীরবে জ্বলে	৪৪
রাজনীতিবিমুখ; মুসলমানদের বড়ো ব্যর্থতা	৪৯
লর্ড ক্লাইভ ও ইতিহাসের কান্না	৫২
হায় ইতিহাস! তুমি কি মুখ খুলবে না	৫৫
হায়দারাবাদের কান্না ও আমাদের শিক্ষা	৫৯
আমাদের দারুণ অনীহা	৬৪
দাম্ভিকের শির ধুলোয় লুটোয়	৬৮
সেনাপতি ও মানুষ সালাহুদ্দিন	৭২
বোম্বাইয়া	৭৮
টিপ ও সিঁদুর : প্রসঙ্গকথা	৮১
মাছির চোখ এবং বই পড়া	৮৪
যুবপ্রজন্ম ও ইতিহাসের বাঁক	৮৭
মজলুমের সাহায্যকারীরা অবশ্যই পুরস্কৃত	৯২
বিশ্বাসঘাতকতার অনিবার্য পরিণতি	৯৬
আল রাজি : জীবনটাই যার চিরবিস্ময়	১০১
রাত পোহালেই ভোরের আলো	১০৭
খলিফা মুসতাইন : কর্ডোভার বুদ্ধিবৃত্তিক রক্ষাকবচ	১১১
ইতিহাস চর্চা ও এব আল্লাহর আনুগত্য	১১৬

মুহাম্মাদ নামের সাথে বেয়াদবি | ১২০
ইসলামের সন্ধানে হাইব্রিড মুসলমান | ১২৩
দাঈদের একাল-সেকাল | ১২৬
শংকর মুসলমান ভয়ংকর | ১৩০
জলযান নৌকার ইতিহাস | ১৩৫
ঘটতে চলছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি | ১৩৯
মানবকল্যাণ নেতৃত্বের সিঁড়ি | ১৪৪
দেশ ও সমাজের রক্ষাকবচ | ১৪৭
অবাক গণতন্ত্র | ১৫১
একটি বিয়ে একটি ইতিহাসের বীজ | ১৫৪
জান্নাতুল হিন্দ টু জাহান্নামুল আরদ | ১৫৮
আনলাকি থার্টিন | ১৬১
সাবধান হে মুসলমান | ১৬৬
ইসলামের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা | ১৬৯
কদর্যদের মুখোশ উন্মোচন | ১৭২
ইতিহাসের ইতিকথা | ১৭৫
যদি অপ্রতিরোধ্য হতে চান | ১৮২

আকলমান্দ কে লিয়ে ইশারা হি কাফি

ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিক; ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাইয়ের কথা। ইতিহাসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সেলজুকদের পরাজিত করেন উসমান গাজি। অতঃপর নিজ বংশের শাসন চালু করেন ছোট্ট এক জনপদে।

উসমান গাজি কি জানতেন, তিনি এক নয়া ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন? জানতেন কি, তিনি মানবেতিহাসের এক কিংবদন্তি নায়কে পরিণত হবেন, আর ইতিহাস তাকে স্মরণ করবে মহানায়ক হিসেবে?

না, তিনি জানতেন না। কারণ, ভবিতব্য কেউই জানে না। তিনিও জানতেন না তার শাসনামল একদিন ইসলামের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে সম্মানিত হবে। তার রচিত এই শাসনব্যবস্থাকেই পরবর্তী বংশধররা একদিন পরিণত করেছে বিশ্বের এক বিস্ময়ে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক দিক বিচারে বিশ্ববিস্ময় এই শাসন ইতিহাস উসমানীয় সাম্রাজ্য নামে পরিচিত।

চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনা পর্যায় থেকে (১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দের পর) শুরু করে পরবর্তী প্রায় ছয়টি শতক ধরে তিলে তিলে গড়ে ওঠে এই শাসনব্যবস্থা। উসমানীয় সাম্রাজ্য বিশ্বে ভূরাজনৈতিক, আদর্শিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্রকে বদলে দিয়েছে চিরদিনের জন্য। আজকের প্রবল শক্তিধর ইউরোপের বুকে কাঁপন ধরিয়ে উসমানি খিলাফত হাঙ্গেরি ও ভিয়েনার দরজায় কড়া নেড়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েছে। আর কাঁপিয়েছে পুরো ইউরোপের বিশাল জনপদ। এখনও ইউরোপীয়রা ঘুমের ঘোরে যেন শুনতে পায় উসমানীয় অশ্বখুরের ধ্বনি! 'তুর্কি' নামটা শুনলেই যেন তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যায়!

ইউরোপ তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। কিন্তু দোরগোড়ায় মুসলমানদের সরব উপস্থিতি ঠেকাতে একত্রিত হয়ে গেল এই শ্বেতাঙ্গরা। উসমানি খিলাফতকে ঠেকানোর জন্য একসাথে কাজ করেছে তারা। অথচ পূর্বে তারা ছিল আপন ঘরে সদা বিবদমান। এ যেন বাঘ আর ছাগলকে এক ঘাটে পানি খাওয়ানোর মতো অবস্থা। বাস্তবে কিন্তু তা-ই ঘটেছে। এ প্রক্রিয়ার হাত ধরেই শেষ পর্যন্ত ইউরোপের বিচ্ছিন্ন গোত্র ও ভূখণ্ডগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে রাজনৈতিক নয়া মেরুকরণ। একপর্যায়ে ইসলামের বিরুদ্ধে গণমনস্তত্ত্ব গড়ে তোলে তারা। মুসলমানদের ঠেকানোর নাম করেই বৃহত্তর জাতিসত্তায় পরিণত হয় তারা। এর পেছনে পুঁজি ছিল খ্রিষ্টধর্মের আদর্শ।

দীর্ঘ ৬০০ বছর ধরে গড়ে তোলা হয়েছে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এই সাম্রাজ্য। অথচ ইহুদি বাবা ও মুসলিম মায়ের সন্তান কামাল পাশা মাত্র ছয়টি বছরেই গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। অবাক হচ্ছেন? হ্যাঁ, মাত্র ছয়টি বছর! আর এই কাজটি সে করতে পেরেছিল তার হাতে থাকা একচ্ছত্র রাষ্ট্রক্ষমতার বদৌলতে।

সেইসাথে আরও ছিল নিষ্কর্মা মুসলিম আলিম নামধারী মুনাফিকতুল্য প্রতিপক্ষ; যারা কিনা মজহাবি বিতর্ক উপভোগ করতে ব্যস্ত থাকত। সরকার বা প্রশাসনের নৈকট্য পেতে ঈমান-আকিদাবিরোধী যেকোনো ফতোয়া দিতে তারা ছিল সদা প্রস্তুত। দুনিয়ার সামান্য খুদ-কুঁড়োর বিনিময়ে আল্লাহর কুরআন আর রাসূল (সা.)-এর আয়াতকে নির্দ্বিধায় বিকিয়েছে এইসব মুখোশধারী আলিম।

কেবলই কি আলিম-উলামারা? না, সেইসঙ্গে অবশ্যই দায় আছে সাধারণ মুসলমানেরও। তুরস্কের বিশাল জনগোষ্ঠী ছিল মুসলমান। তারা ধর্মকর্ম, নামাজ-রোজা, জিকির-আজকার ও তাসবিহ-তাহলিল নিয়ে বেশ ছিল! তবে উদাসীনতা ছিল কেবল রাজনীতিতেই! দেশ পরিচালনা কিংবা রাজনীতি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। আর এ অবস্থা ছিল কামাল পাশার জন্য শাপে বর!

কামাল পাশা ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে ইসলামি খিলাফতকে বিলুপ্ত করে তুরস্ককে তথাকথিত আধুনিক গণতান্ত্রিক ও সেক্যুলার রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। এরপর থেকে ১৯২৮ সাল; মাত্র পাঁচ বছর বা তারও কিছু বেশি সময়কালের মধ্যে একে একে নামাজ, পর্দা, হিজাব, ইসলামি ক্যালেন্ডার, আরবি বর্ণমালা, আরবি শিক্ষা, মাদরাসা, শরয়ি আদালত, ওয়াকফ বোর্ড—সবকিছুই বন্ধ করে দেয়।

শুধু কি তা-ই! রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার মাধ্যমে মসজিদগুলোকেও বন্ধ করে দেয় সে। আর সেগুলোকে পানশালা, নাইট ক্লাব হিসেবে রূপান্তর করে দেয় নির্দ্বিধায়। ইসলামি পোশাক পরা, পুরুষদের দাড়ি রাখা, আজান দেওয়া, সুন্নতে খতনাসহ মুসলমানি রেওয়াজ-রসমও বন্ধ করে দেয়। জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে এমন ন্যক্কারজনকভাবে অবজ্ঞা করাটাই কি একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শর্ত ছিল? এগুলো কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক ছিল? উত্তর আসবে—না। কিন্তু সে এসব ঘৃণ্য কাজ নির্দ্বিধায় করে গেছে। এর পেছনে ছিল ইউরোপীয় সেক্যুলারদের উন্মাদনার জোয়ার।

উন্মাদনা আরও ছিল। বেতনভুক্ত, আত্মবিকৃত বুদ্ধিজীবী ও মুক্তচিন্তক নামধারী কিছু দালালকে সে মাঠে নামিয়েছিল। তাদের মিশন ছিল ইসলামকে নিন্দিত ও বিতর্কিত করা। এসব দালাল সারা দেশ চষে বেড়িয়ে ইসলামকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরেছে। আর তাদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সরকারি-বেসরকারি প্রচারমাধ্যমগুলো। তারা ঢালাওভাবে প্রচার করেছে আত্মবিকৃত এসব বুদ্ধিজীবীর চিন্তাধারা।

ইসলাম আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দৌড়ে কতটা পশ্চাৎপদ, কতটা সেকেলে, কতটা অনুপযুক্ত, কেন এবং কীভাবে ইসলামি উপাদানগুলো বিশ্বের অন্যান্য জাতিসত্তার চেয়ে মুসলমানদের পিছিয়ে রেখেছে, এসব ইনিয়ে-বিনিয়ে তুর্কি জনগণকে বোঝানোর মিশনে নিরলস কাজ করেছে তার দল! কোনো বাধার সম্মুখীন হওয়া তো দূরের কথা; বরং সরকার-প্রশাসনের সর্বস্তর থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়েছে। সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হয়েছে নানাভাবে।

তাদের বিপরীতে সত্যানুসন্ধানী বুদ্ধিজীবী, আলিম-উলামাগণ ইসলামের পক্ষে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। আফসোস! রাতারাতি তাদের ওপরে নেমে এসেছে অত্যাচারের স্টিমরোলার। নির্যাতনের হেন কোনো পথ-পদ্ধতি বাদ ছিল না, যা তাদের ওপর প্রয়োগ করা হয়নি। প্রথমে সরকারি আদেশ-নিষেধ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হতো। তাতে কাজ না হলে চিরদিনের জন্য গুম করা হতো। বিচারের নামে কারাদণ্ড কিংবা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে অনেক আলিমকেই। অথচ

কেউ এগিয়ে আসেনি। তাদের আকুতি-আর্জিতে সামান্য কর্ণপাত করেনি গাফেল মুসলিম জনতাও।

হ্যাঁ, তুরস্ককে আধুনিকায়নের নামে এসব জঘন্য অনাচার চালানো হয়েছে। আর দেশপ্রেমের প্রমাণ দিতে জনগণকেও তা সহ্য করতে হয়েছে; উপরন্তু বাধ্য করা হয়েছে। অমানবিক জুলুম-নির্যাতন দেখেও মুখ বন্ধ রেখেছে জনসাধারণ। কেননা, প্রতিবাদ করার মানেই হলো দেশদ্রোহিতা। সরকার ও কামাল আতাতুর্ক; ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মিলে একাকার হয়ে গেছে। আতাতুর্ক যা বলেছেন, তা-ই আইন। তার কার্যক্রমের ব্যত্যয় হওয়ার যেন কোনো সুযোগ ছিল না। তার মতের বিরোধিতা সহ্যও করা হয়নি।

কামালের এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থ ছিল বললে ভুল হবে। সে বরং এগুলো করেছিল ইসলামকে তুরস্কের মাটি হতে উৎখাত করার জন্য। আর সেটাই ছিল তার জীবনের মিশন এবং সকল অন্যায়-অনাচারের মূল উদ্দেশ্য।

এই বদ উদ্দেশ্যকে ঘিরে সমকালীন আলিম-উলামা আর আপামর তুর্কি জনতার প্রতিক্রিয়া কী ছিল? তারা কি কামালকে রুখে দিতে দল-মত-মাজহাব ভুলে একযোগে এগিয়ে এসেছিলেন? তারা কি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বুক চিতিয়ে সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন?

দুঃখজনকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর হবে—না, তারা এগিয়ে আসেনি; বরং কামালের পেছনে জনসমর্থনই লক্ষণীয় ছিল। বস্তুত চুপ থাকাও তো সমর্থন-সম্মতিরই বহিঃপ্রকাশ। দু-চারজন আলিম-উলামা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে কামাল আতাতুর্কের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রয়াস চালিয়েছেন বটে। পরিতাপের বিষয়, তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। ছিল না সুদূরপ্রসারী কোনো লক্ষ্য ও কর্মসূচি। সাধারণ জনগণ, এমনকি অনেক ইসলামপন্থি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও সেই দুর্যোগের ঘনঘটায় কামাল আতাতুর্কের কর্মকাণ্ডে সমর্থন জুগিয়েছেন কিংবা চলেছেন গা বাঁচিয়ে।

তাদের সেই সময়কার নিষ্ক্রিয়তার খেসারত কেবল তুর্কিদেরই দিতে হয়নি, দিতে হয়েছে পুরো মুসলিম উম্মাহকে। আর সে ধারা চলেছে যুগের পর যুগ। পুরো একটা জাতিকেই ইসলামের তাহজিব-তামাদ্দুন, শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে সরিয়ে ফেলেছে কদর্য এক মুশরিকি সংস্কৃতি। এমনকি এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি তাদের মাতৃভাষাটাও। সাড়ম্বরে বদলে দিয়েছে মানুষের মুখের ভাষা।

আজও তারা সেদিনের সেই ভুলের মাশুল গুনে চলেছেন। শুধু তুর্কি জনগণই নয়; বরং উসমানি খিলাফতের বিলুপ্তি পুরো উম্মাহকে শতধা বিভক্ত করেছে। দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান নানা গোলামিতে নিমজ্জিত করে রেখেছে তাদের।

ইতিহাসের এহেন নির্মম বাস্তবতাকে সামনে রেখে একটিবার নজর বোলান আপনার আশেপাশে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বিদ্যমান রাজনৈতিক-সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিসরের দিকে। কিছু কি বুঝতে পারছেন? জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। কথায় আছে না, আকলমান্দ কে লিয়ে ইশারাই কাফি হায়!

হায়! আমাদের উপায় কী

৬৪৪ সালের ১ নভেম্বর শুক্রবার ভোরে মসজিদে নববিতে ফজরের নামাজে ইমামতির জন্য দাঁড়ালেন আমিরুল মুমিনিন উমর (রা.)। ঠিক তখনই ফিরোজ আবু লুলু বিষাক্ত ছুরি দিয়ে পরপর ছয়টি আঘাত হানে উমর ফারুক (রা.)-এর পেটে। সেই আঘাতে তাঁর নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে। ফিরোজ আবু লুলু ছিল বসরার গভর্নর মুগিরা ইবনে শুরা (রা.)-এর মদিনাস্থ দাস। সে পারসিক বংশোদ্ভূত।

ওই দিন দুপুরের পর উমর (রা.)-কে সামান্য দুধ পান করতে দেওয়া হয়। কিন্তু হজম হওয়া ছাড়াই কাটা স্থান দিয়ে তা বেরিয়ে আসে। এমন অবস্থা দেখে সকলেই বুঝতে পারেন, খলিফার অবস্থা আশঙ্কাজনক। খলিফা নিজেও বুঝতে পেরেছেন, এখন আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করার পালা।

পরদিন শনিবার খলিফা তাঁর পুত্র প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে কাছে ডেকে নিলেন। আবদুল্লাহ পিতার মুখের কাছে মাথাটা একটু এগিয়ে নিতেই উমর (রা.) অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুললেন। কী বলেছেন তিনি? সেটা বলার আগে আরও একটা ঘটনা বলে নিই।

মদিনা শহর থেকে শ দুয়েক মাইল দূরে সিরিয়ামুখী ৬৫৬ মাইল লম্বা একটি প্রাচীন রাস্তা। তার পাশেই এক বেদুইনপল্লি। সময়কাল সম্ভবত ৬৩৬-৩৭ সাল। খলিফা উমর প্রায়ই মদিনা ছেড়ে রাজ্যের অলিগলিতে ঢুকে পড়তেন সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য। এ রকমই একটা সফরে তিনি এসেছেন এই এলাকায়। সফরসঙ্গী আলি (রা.)। তিনি খলিফার কাছ থেকে খানিক দূরে কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

এমন সময় উমর (রা.) দেখলেন, পথের ওপরেই এক বৃদ্ধ মহিলা। তার পাশে একটি তাঁবু খাটানো আছে। কৌতূহলী খলিফা বৃদ্ধার পাশেই থামলেন। জানতে চাইলেন রাস্তার ওপর একাকী বসে থাকার কারণ। বৃদ্ধা তার জীবদ্দশায় কখনো খলিফা উমর (রা.)-কে দেখেননি, কেবল নামই শুনেছেন। এক আগন্তুকের অযাচিত প্রশ্নে প্রচণ্ড বিরক্তির সাথে তিনি বলে উঠলেন—'শুনেছি আমিরুল মুমিনিন উমর (রা.) আজ এ পথে যাবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করা খুব দরকার। তাই রাস্তার পাশে তাঁবু খাটিয়ে বসে আছি।'
উমর (রা.) হাঁটু গেড়ে বৃদ্ধার পাশে বসলেন। খুব আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলেন—'আচ্ছা বৃদ্ধা মা আমার! আমিরুল মুমিনিন লোকটা কেমন?'

বৃদ্ধা বললেন—'ওই বদ লোকটার কথা আর জানতে চেয়ো না তো বাপু। তার কথা শুনে তোমার কী কাজ? তুমি বরং তোমার কাজে যাও।'

'ওমা, সে কী কথা! খলিফাকে আপনি বদ লোক বলছেন?'

‘বদ লোক বলব না? কত কষ্টে দিন পার করছি আমি। অথচ আজ পর্যন্ত খলিফার নিকট থেকে একটা কানাকড়িও সাহায্য পেলাম না!’

বৃদ্ধার এ কথা শুনে উমর (রা.) ভেতরে ভেতরে আঁতকে উঠলেন। কোমল কণ্ঠে তিনি বললেন—‘মা! আপনি তো খলিফা থেকে অনেক দূরে থাকেন। তিনি হয়তো আপনার এই কষ্টের খবরই পাননি।’ বস্তুত এর মাধ্যমে তিনি খলিফাকে কিছুটা মুক্ত করার চেষ্টা চালালেন।

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন—‘দূরে থাকার কারণে তিনি যদি আমার খবরই না নিতে পারেন, তাহলে তাকে খলিফা হতে কে বলেছে?’

ক্ষোভ আর অনুযোগ মেশানো কণ্ঠে বৃদ্ধা এক ঝটকায় কথাগুলো বলে গেলেন। উমর (রা.)-এর কপালে এবার চিন্তার ভাঁজ। বাক্‌রুদ্ধ হয়ে তিনি ডুবে গেলেন ভাবনার গভীরে! হ্যাঁ, আনাচে-কানাচে না জানি আরও কত অসহায়, দুঃখী-দুস্থ ও অভাবগ্রস্ত মানুষ আছে, অথচ খলিফা বেখবর! খবরই যদি নিতে না পারেন, তাহলে তাদের খলিফা হতে গেলেন কেন?

উমর (রা.)-এর মনোজগতে তখন নীরব-নিভৃতে বয়ে চলেছে অদ্ভুত এক ঝড়। পাশে বসা বৃদ্ধার সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই! তিনি পথ চেয়ে আছেন, কখন আসবে আমিরুল মুমিনিন।

এদিকে আলি (রা.) অনতিদূরে লোকজনের সাথে কথা শেষ করে এগিয়ে এলেন খলিফার খোঁজে। রাস্তার পাশে এক মহিলার সঙ্গে আমিরুল মুমিনিনকে দেখতে পেয়ে সাগ্রহে এগিয়ে এলেন তিনি। ভাবনা-বিভোর খলিফা তা খেয়াল করলেন না। আলি (রা.) তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন। আনমনা হয়ে বসে থাকা উমর (রা.)-এর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সালাম দিলেন—‘আসসালামু আলাইকুম ইয়া আমিরুল মুমিনিন!’

হঠাৎই সংবিৎ ফিরে পেলেন উমর ফারুক (রা.)। তিনি সালামের জবাব দিলেন বটে, কিন্তু ততক্ষণে তাঁর পাশে বসে থাকা বৃদ্ধা তা শুনে ফেলেছেন। তিনি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন—‘আমিরুল মুমিনিন? আ আনতা আমিরুল মুমিনিন উমার?’ অর্থাৎ তুমিই কি খলিফা উমর?

উমর (রা.)-এর স্বকণ্ঠ জবাব—‘হ্যাঁ মা! আমিই আপনাদের হতভাগা খলিফা উমর।’

এবার বৃদ্ধা লজ্জিত হলেন, কিছুটা ভয়ও পেলেন। আলি (রা.) তেমন কিছু না বুঝলেও কিছু একটা আঁচ করতে পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন। মহিলা উমর (রা.)-এর দিকে বিব্রত ও ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালেন, যা খলিফার নজর এড়াল না।

এরপর উমর (রা.) অনেকক্ষণ কাঁদলেন বৃদ্ধার সাথে। তাকে আশ্বস্ত করলেন। শুনলেন তার যাবতীয় অভাব-অনুযোগ-অভিযোগের কথা। তাকে রাষ্ট্র থেকে পেনশনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিন্তু তিনি তো ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন অনেক আগেই। আর এই বৃদ্ধা তো সেই শুরু থেকেই পাওনাদার। তাহলে এই বিগত দিনগুলোর বকেয়ার কী হবে? তিনি সেখানে বসেই একটা হিসাব কষলেন। সেই হিসাবে বৃদ্ধাকেও শামিল করলেন। অংশ নিলেন আলি (রা.)-ও।

হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেল, মোটামুটি ২৫টি স্বর্ণমুদ্রা হলে তার পাওনা পরিশোধ হয়। তিনি বৃদ্ধার হাতে ২৫টি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে আশাতিরিক্ত পেয়ে বৃদ্ধাও যারপরনাই খুশি; কিন্তু উমর

(রা.) এতটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। বৃদ্ধাকে অনুরোধ করলেন, তাঁর ওপর অর্থাৎ আমিরুল মুমিনিন উমর (রা.)-এর ওপর বৃদ্ধার যে আর কোনো দাবি নেই, এই কথাটা আলি (রা.)-এর সামনে ঘোষণা দিতে, চাইলে তিনি লিখেও দিতে পারেন। অতঃপর তিনি সানন্দচিত্তে একটা চামড়ার ওপর 'না দাবিনামা' লেখায় টিপসই দিলেন। আশ্বস্ত করলেন, কিয়ামতের মাঠে খলিফার বিরুদ্ধে আর কোনো দাবি তুলবেন না।

এক অখ্যাত বৃদ্ধার কাছ থেকে পাওয়া এই শিক্ষা খলিফা উমর (রা.)-কে প্রচণ্ড প্রভাবিত করেছিল। এরপর তিনি প্রায়ই বলতেন—'আল্লাহর কসম! ফোরাতের তীরে একটা কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায়, আমার ভয় হয়, কিয়ামতের মাঠে আমাকে তার জন্যও জবাবদিহি করতে হবে!' এ কথা বলে তিনি অঝোরে কাঁদতেন!

জি। মৃত্যুশয্যায় আমিরুল মুমিনিন কী বলতে চাচ্ছেন, এবার ফিরে আসি সে আলোচনায়। ওই বৃদ্ধার মাধ্যমে যে ভয় তিনি পেয়েছিলেন, তা আজও কাটেনি। পুত্র আবদুল্লাহ (রা.)-কে বললেন, দ্রুত হিসাব করে দেখতে—ক্ষমতারোহণের দিন থেকে একজন খলিফা হিসেবে তিনি কী পরিমাণ অর্থ বেতন-ভাতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, মৃত্যুর পর যত দ্রুত সম্ভব উমর (রা.)-এর সম্পত্তি বিক্রি করে যেন সেই অর্থ পুরোটাই বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেওয়া হয়।

তিনি তাঁর প্রাপ্য বেতন-ভাতাও নেবেন না এই ভয়ে, যদি তাঁর দায়িত্বপালনে কোনো গাফিলতি হয়ে থাকে! যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে না-ই পারলেন, বেতন-ভাতা গ্রহণ তো অবৈধ সাব্যস্ত হবে!

পরদিন ৩ নভেম্বর, রবিবার, খলিফাতুল মুসলিমিন ইন্তেকাল করলেন। তাঁর সেই অসিয়ত সহসায় পালন করা হয়েছিল। দীর্ঘ এক দশক সময়কালে খলিফা হিসেবে নেওয়া ভাতা ৬৮ হাজার দিরহাম রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনাটা জানার পর থেকে ভেবে হয়রান হচ্ছি, আমাদের ১৮ কোটি জনতার কাছে কার যে কতটা দায় রয়ে গেছে, তার হিসাব কে রাখে? রাঘব-বোয়ালদের কথা না হয় বাদই দিলাম। নিজেদের কথাই বলি। সংসারে কতভাবে জেনে না-জেনে কতজনের কত হক নষ্ট করেছি! বুঝে না-বুঝে কতজনের ওপর কত জুলুম করেছি। জুলুমের উপলক্ষ্য হয়েছি কিংবা হতে দিয়েছি! আজ এই বয়সে এসে তাদের হাতে সেই বৃদ্ধা মহিলার মতো করে কিছু স্বর্ণমুদ্রা বা টাকা ধরিয়ে দেবো, সে সামর্থ্যও তো নেই। হায়! আমাদের উপায় কী?

আর সেই ভুল করব না, প্রমিজ

অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশক (১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে হরণ করছে ইংরেজ জাতি। তখন পুরো উপমহাদেশের লোকসংখ্যা ছিল ২৫০ মিলিয়ন বা ২৫ কোটি। তারা গোত্র-ধর্ম-মত ইত্যাদি ইস্যু ধরে বহুধা বিভক্ত ছিল। অথচ সবাই একই জনপদের বাসিন্দা। এখানেই জন্ম নিয়ে বাস করছে যুগের পর যুগ। এখানকার আলো-বাতাসেই তাদের বেড়ে ওঠা। এখানেই বেঁচে থাকা। এই মাটিতেই শেষ নিশ্বাস ও চিরনিদ্রার শয়ন।

মাদ্রাজ উপকূল থেকে শুরু করে ভাগীরথী পারের সুতানুটি গ্রাম; কী বিশাল এলাকা! পরবর্তী সময়ে এটিই হয়ে উঠেছিল সকল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা। আর অন্যদিকে খোদ দিল্লি পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইংরেজদের সংখ্যা এক লক্ষেরও কম ছিল। তাদের মধ্যে ছিল পর্যটক, সৈন্য, বণিক-ব্যবসায়ী, কূটনীতিবিদ, ধর্মপ্রচারক এবং বিভিন্ন পেশার ছদ্মবেশ ধারণকারী গুপ্তচর।[১]

খাবারের খোঁজে ছুটে আসা আগন্তুক ইংরেজদের বাস্তুভূমি ইংল্যান্ড ছিল স্যাঁতসেঁতে কাদায় পরিপূর্ণ এক নোংরা বস্তি। ঘিঞ্জি-দুর্গন্ধময় সেই এলাকা এতটাই বসবাস-অযোগ্য, যার দরুন ফরাসি রাজা রিচার্ড ইংল্যান্ড জয় করার পরও সেখানে থাকতে চাইতেন না। তার পুরো জীবনে মাত্র কয়েক দিন সেখানে ছিলেন। একদম ঘৃণায় যেতেই চাইতেন না ওই এলাকায়। অথচ আমৃত্যু তিনিই ছিলেন তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজা।

অভাব-অপুষ্টিতে, বিধ্বস্ত-পর্যুদস্ত এক জনপদ। একমুঠো খাবারের জন্য, কয়েকটা আলুর খোঁজে ছুটে বেড়াত সারা বেলা। আর ভারতভূমি? কী ছিল না? শৌর্যে-বীর্যে, ফুলে-ফসলে ও সম্পদে-শক্তিতে ভারত ছিল এক অনুপম স্বর্গরাজ্য। প্রকৃতি যেন তার ওপরে সকল কল্যাণ ঢেলে দিয়েছিল অকৃপণ হাতে।

২৫ কোটি বনি আদম এখানে পরম মমতাময় নিবিড় সুখে দিনাতিপাত করতেন। প্রশান্ত মন-মগজে কেবলই কবিতা-শের; সুর আর সুরা। বাতাসে ভাসত সুর, নূপুর ও নাচের হর্ষধ্বনি। প্রমোদমত্ত এই জাতির সম্রাটেরা ভোগবিলাসে মগ্ন থাকত। এর মাত্রাটা এতটাই প্রকট ছিল, একজন মহামতি পাঁচ হাজার রক্ষিতাও রেখেছিলেন!

এখানকার রাজা-বাদশারা বসতেন সোনার সিংহাসনে। মাথায় শোভা পেত মণিকাঞ্চন শোভিত মূল্যবান মুকুট। কোনো এক অখ্যাত কবির একটা মাত্র শের, কিংবা শ্লোক পছন্দ হলেই তার ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে যেত। জীর্ণ কুটিরখানা ভরে যেত রাজকোষ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের নজরানায়। পুষ্কুরিনিতে শখের মাছের নাকেও হীরার নোলক পরাতেন শৌখিন বাদশাহগণ!

---

[১] *Rise and fall of the British Empire,* Lawrence James, পৃ. ১১৮

কখনো কি একবারের জন্যও একটি বিষয় ভেবে দেখেছেন, বিপুল সম্পদ ও শক্তিতে ভরপুর এ রকম বিশাল একটি জনপদ ভারত। আর সেই সাত সাগর তেরো নদী পার হয়ে আসা একদল শ্বেতাঙ্গ মিসকিন এই জনপদের ২৫ কোটি বাসিন্দাকেই দাস বানিয়ে রেখেছিল? অর্থাৎ মাত্র একজন ইংরেজ তার জন্মস্থান থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরের জনপদে এসে ২৫০০ মানুষকে জিম্মি করেছিল। তাও একদিন, এক মাস, এক বছর নয়; ১৯০টি বছর শোষণ করেছে এই নিয়ামতপূর্ণ জনপদকে। তারপর নিঃস্ব করে বিদায় নিয়েছে। এর পেছনের কারণ কী ছিল? আপনার ব্যক্তিত্ব, নামধাম, যশ-খ্যাতির সমস্ত সফলতাকে মুহূর্তের জন্য একপাশে রেখে এই আত্মান্বেষণ কি কখনো করে দেখেছেন?

হ্যাঁ, এমনটি হতে পেরেছিল মুসলিম নামধারী শাসকদের গৃহিপনা ও আত্মভোগে মগ্ন থাকার কারণে। তারা আপামর জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের কোনো প্রচেষ্টা তো দূরে থাক, চিন্তাও করেনি। মাত্র হাতে গোনা দু-একজন ছাড়াই সব শাসকের অবস্থা এমনই ছিল। রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো, তার নাগরিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির পথ স্পষ্ট করে দেওয়া। সাধারণ মানুষের আয়-রোজগারের জন্য যুগের সবচেয়ে উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; কিন্তু তারা সেটা করেননি।

দু-চারজন ব্যতিক্রম ব্যতীত নিজেরা শাসক সেজে অন্দরমহলে আয়েশি জীবন কাটিয়েছেন। অন্যদিকে জনপদের সাধারণ মানুষ নিজেরা মাঠে-ময়দানে খেটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্য উৎপাদন করে খেয়েপরে বেঁচেছে। কেবল তো নিজেরাই খায়নি, শাসকবর্গ ও তাদের পরিবার-পরিজনকেও খাইয়েছে। তাদের বিলাসিতার খোরাক ও উপাদান জুগিয়ে গেছে।

আপামর জনগণের মধ্যে কি বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো কাজই হয়নি? হয়েছে কিছুটা, তবে তা যৎসামান্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লেখাপড়া চলেছে ব্যক্তির দান-দক্ষিণার ভিত্তিতে; রাষ্ট্রের বদান্যতায় নয়। করা হয়নি শিক্ষাব্যবস্থার কোনো আধুনিকায়ন। ২২ হাজার শ্রমিকের ঘাম আর রক্ত মেশানো শ্রম দিয়ে টানা ২২ বছর ধরে এক তাজমহল বানাতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা দিয়ে সেকালে পুরো ভারতবর্ষে অন্তত ১০০ অক্সফোর্ড-ক্যামব্রিজ সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বানানো যেত। সেটা করা তো দূরের প্রসঙ্গ, এই উন্নীতের কথা ভাবাই হয়নি।

আর এ কারণেই যুগোপযোগী শিক্ষা পায়নি ভারতীয় জাতি। তাইতো ভারত দখলের পর এক ইংরেজ সুশীল Lord Ellenborough খোদ ভারতে বসেই তার অপর এক সহকর্মীকে আলাপের ছলে বলতে পেরেছিলেন—

> ‘You Know if these gentlemen succeed in educating the natives to the utmost extent of their desire, we should not remain in the country three months. Not three weeks was the reply?
>
> অর্থাৎ তুমি কি জানো, এই লোকেরা যদি দেশবাসীকে তাদের সামর্থ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে, তাহলে আমরা এখানে তিনটি মাসও টিকতে পারব না?’[২]

তার এ কথার জবাবে উক্ত সহকর্মী বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন—‘তিন মাস? তিনটি সপ্তাহও নয়।’

---

[২] *Rise and fall of the British Empire,* Lawrence James, পৃ. ১২০

জনপদের বাসিন্দারা যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে সাত সাগর পেরিয়ে আসা ইংরেজদের ভাষ্যমতে, তারা তিনটি সপ্তাহও টিকতে পারত না। সেই তারাই কিনা এখানে একনাগাড়ে প্রায় ২০০ বছর শাসন ও শোষণ করেছে!

আশা করি বুঝতে পারছেন, এ দেশ ও সমাজের কার্যকর উন্নয়নের সবচেয়ে মোক্ষম পথ কোনটি? এখন নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পারছেন, এ জাতির উন্নয়ন ও মুক্তি নিশ্চিতের জন্য কোন কাজটি সবার আগে করতে হবে! আপনি যদি এই দেশ-সমাজ-জাতি ও নিজের কল্যাণ চান, তবে আগে প্রয়োজন নিরন্তর জ্ঞানচর্চা করা। পাশাপাশি জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যান। আর এটা কোনো সাময়িক কাজ নয়। অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে প্রক্রিয়াধীন দায়িত্ব।

পেটের ভাত জোগানোর জন্য দরকার ছিল একটি চাকরি। আর ওই চাকরির জন্য দরকার ছিল কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে ঝকঝকে সার্টিফিকেট। সেটা পেয়ে খুঁজে নিয়েছেন একটু আয়েশে বেঁচে থাকার পথ। এরপর জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ভেবে নিশ্চুপ। জেনে রাখুন, এই ভাবনা বড়োই আত্মঘাতী। আত্মহত্যার শামিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। আর এই মারাত্মক ভুলটাই করেছিলেন আমাদের ভারতবর্ষের পূর্বসূরিরা। অন্যদিকে ফাঁকা গোল দিয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শ্বেতাঙ্গ তস্কররা।

আমরা আর সেই একই ভুল করব না। নিজে বাঁচুন। নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচান। সেইসাথে নিরন্তর জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে এই দেশ ও জাতির উজ্জ্বল আগামী ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে মুক্তির পথ ও সম্মান-মর্যাদার নিশ্চয়তা। আছে সুখ-শান্তি-প্রগতির ঠিকানা। অতএব, লেগে পড়ুন। আজই, এক্ষুনি।